ভঙ্গুর 'আমি' ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

'Things fall apart; the centre cannot hold...'
– W. B. Yeats

প্রতিটি মানুষেরই একটা 'আমি' আছে এবং এই 'আমি'কে ঘিরেই তার সকল ইহজাগতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। 'আমি' আছে বলেই সম্ভবতঃ মানুষ নিজেকে চিনতে পারে, আর এই 'আমি'-কে শক্তিশালী করে টিকিয়ে রাখতে তার প্রচেষ্টারও অন্ত নেই। কারণ, প্রত্যেকেই তার 'আমি'-কে খুব ভালোবাসে। ভালোবাসা, ঘৃণা, ভয়, লোভ, রোমাঞ্চ, কামনা, বাসনা ইত্যাকার অনুভূতির অস্তিত্বতো 'আমি'কে কেন্দ্র করেই! কিন্তু, যদি প্রশ্ন করা হয়, 'আমি'-টা কী, তাহলে এর উত্তর দেওয়াটা কারো পক্ষেই ততো সহজ হবে না। এ এক রহস্যময় গোলক-ধাঁধাঁ, যা আমরা সকলে বহন করি, অথচ এটা কী তা বলতে গেলে ততো সহজে বলা যায় না।

'আমি' নিয়ে ভাবনার ইতিহাসও সুপ্রাচীন। ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, সমাজবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানে নানাভাবে 'আমি'-কে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এর নানা নামের সাথেও আমরা পরিচিত, যেমন, আত্মন্, অহম, ইগো, সেলফ ইত্যাদি। পণ্ডিতদের আলোচনায় যাই থাক, সাধারণ মানুষ হিসেবে যদি আমাদের ভাবতে বলা হয় যে এই মুহূর্ত থেকে 'আমি' বলে আর কিছু নেই এবং সত্যিই যদি সেটা ঘটে তাহলে কী হবে? আমরা বর্তমানে উপস্থিত থেকেও হারিয়ে যাব, নিজেকেই খুঁজে ফিরবো, চারপাশের কোন কিছুই সম্ভবতঃ আর কোন অর্থ বহন করবে না। 'আমি'-কে হারিয়ে ফেলাটা সচরাচর না ঘটলেও, জীবনের নানা পর্যায়ে অনেকের 'আমি'-ই বিপর্যস্ত, দুর্বল এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, যেখান থেকে উদ্ধার পাওয়াটাও কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ সকলেই চায় একটা সুস্থ, সবল আর আনন্দময় 'আমি'-র সাথে বসবাস করতে।

মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, তিনটি কারণে 'আমি' বা 'সেলফ' (Self)-এর ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, নিজের সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা, যা 'আমি' বা 'আমার' শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়, যা আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে প্রকাশ করে। দ্বিতীয়তঃ, অসংখ্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে আমরা নিজের সম্পর্কে যা ভাবি (যেমন, 'আমি ভালো' বা 'আমি খারাপ') অনেক ক্ষেত্রেই তা আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করে। তৃতীয়তঃ, মানুষের ব্যক্তিত্বের সংগঠিত এবং সমন্বিত ক্রিয়াশীলতা বোঝাতে 'আমি' বা 'সেলফ'-এর ধারণা অপরিহার্য। অথচ, 'আমি' বা 'সেলফ'-এর অস্তিত্ব স্বীকার করলে আমাদের দায়িত্ব হয় একে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা যাতে একে পদ্ধতিগত গবেষণার আওতায় আনা যায়। কিন্তু, তেমনটি করা কি সম্ভব হয়েছে?

মনোবিজ্ঞানে 'সেলফ'-এর ধারণা অনেক পুরনো এবং এর যাত্রা অতি চমকপ্রদ। এই শাস্ত্রে কখনও এটি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে, কখনও আবার প্রায় হারিয়ে গেছে। যেমন, বর্তমান সময়ে অনেক মনোবিজ্ঞানীই মনে করেন, সেলফ সকল মনোজাগতিক ক্রিয়াশীলতার কেন্দ্রীয় বিষয় (এপস্টেইন, ১৯৯০; মারকাস ও ক্রস, ১৯৯০)। আবার, বিহেভিয়রিজমের স্বর্ণযুগে 'সেলফ' একটি মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা হিসেবে প্রায় লুপ্তই হয়ে গিয়েছিল। মনোবিজ্ঞানীরা তখন 'সেলফ'কে একটি এলোমেলো, অস্পষ্ট ধারণা হিসেবে গণ্য করতেন - মনে করতেন এটি পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য এবং সেকারণে বিজ্ঞানসম্মতভাবে একে জানা সম্ভব নয়। মনোবিজ্ঞানীদের একাংশ এখনও এটাই মনে করেন।

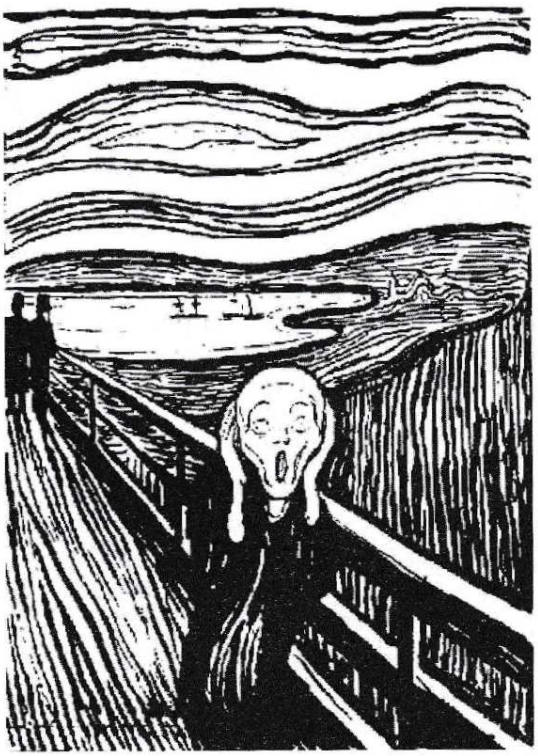

মার্কিন মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস্ তাঁর প্রিন্সিপলস্ অব সাইকোলজি গ্রন্থের (১৮৯০) একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে সর্বপ্রথম 'সেলফ'-এর বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করেন। অদ্যাবধি মনোবিজ্ঞানে 'সেলফ' বিষয়ে যে কোন আলোচনায় জেমস্-এর রেফারেন্স-এর পাশাপাশি সমসাময়িক মনোবিজ্ঞানী কুলি (১৯০২), মিড (১৯৩৪) ও বডউইন (১৮৯৫)-এর অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। মনোবিজ্ঞানে এঁরা সিম্বোলিক ইন্টার‍্যাকশনিজম (Symbolic Interactionism) ধারার অনুসারী।

বর্তমানে 'সেলফ'-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে নানামাত্রিক গবেষণা সাইকোলজিতে চালু আছে। 'সেলফ-এস্টিম', 'সেলফ-এফিক্যাসি', 'সেলফ-রেগুলেশন', 'সেলফ-কনসেপ্ট' ইত্যাকার ধারণাগুলো 'সেলফ'-এর বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করে। কিন্তু 'সেলফ' বিষয়টি আসলে কী, সেটি সাইকোলজিতে এখনও অমিমাংসিত। বিজ্ঞান হিসেবে সাইকোলজির একটি বড় দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা সম্ভবতঃ এই যে এটি কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ধারণার বিভিন্ন দিককে অস্তিত্বশীল ও সত্য বলে ধরে নিয়ে কাজ করে, কিন্তু মূল ধারণাগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে 'মন' এবং 'সেলফ'-এর উল্লেখ করা যায়। এ দুটির কোন সংজ্ঞা সাইকোলজিতে পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু এদের নিয়ে গবেষণার কোন শেষ নেই। তবে, আমরা ধারণা করতে পারি যে 'সেলফ' 'মন'-এরই কোন সাব-সেট (sub-set) এবং এর সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম আছে।

উইলিয়াম জেমস্ 'সেলফ'কে দুটি পরস্পর সম্পূরক ধারণার একটি সিস্টেম হিসেবে গণ্য করেছেন। এর একটি হচ্ছে ব্যক্তির সকল কর্মের কর্তারূপী এবং জ্ঞাতারূপী 'আই-সেলফ' (I-self) এবং অপরটি কর্তার কর্মের অভিজ্ঞতার ধারকরূপী

'মি-সেলফ' (Me-self)। 'আই-সেলফ' হচ্ছে সক্রিয় কর্তা, যে চিন্তা করে, অনুভব করে, ক্রিয়া করে। ব্যক্তির সকল অভিজ্ঞতাকে সে অরগানাইজ করে ও এর সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রীক ব্যাখ্যা দেয়। এটি এমন কিছু যা সময়ের ধারাবাহিকতাতেও নিরবচ্ছিন্ন থাকে এবং যা অন্যদের থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখে এবং এভাবে তা আমাদের একটা আইডেনটিটি অর্থাৎ পরিচয় দান করে। অপরদিকে 'মি-সেলফ' হচ্ছে 'সেলফ' সম্পর্কে বিষয়নিরপেক্ষভাবে যা জানা যায় তার সমষ্টি। জেমস্ মনে করতেন, কর্তা (সাবজেক্ট) হিসেবে 'সেলফ', যাকে তিনি 'আই' হিসেবে গণ্য করেন, তা 'সেলফ'কে একটি জানার বিষয় (অবজেক্ট) হিসেবেও চিন্তা করতে সক্ষম - 'সেলফ' যখন জানার বিষয় তখন তা 'মি'। সুতরাং, যদি বলা হয়, 'আমি আমার সম্পর্কে চিন্তা করছি,' তাহলে এ বাক্যটি 'সেলফ'-এর দুটি দিককেই প্রকাশ করে।

'আই-সেলফ' বা 'আমি'-র চারটি বিশেষ উপাদান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে (১) 'আমি' বিষয়ে সচেতনতা (self-awareness): ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অবস্থা, তার চাহিদা, চিন্তা এবং অনুভূতি বিষয়ে সজাগ থাকা; (২) স্ব-নিয়ন্ত্রণ (self-agency): নিজের চিন্তা ও কর্মের ওপর ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ; (৩) 'আমি'র নিরবচ্ছিন্নতা (self-continuity): সময়ের আবর্তনেও একজন ব্যক্তি একই থেকে যায়, এই বোধ এবং (৪) 'আমি'র সঙ্গতিময়তা (self-coherence): নিজেকে একটি একক, সঙ্গতিপূর্ণ এবং সীমায়িত সত্তা হিসেবে ভাবতে পারা। একটি সুস্থ 'সেলফ' বা 'আমি'র এই বৈশিষ্ট্য জীবনের নানা টানা-পড়েনে দারুণভাবে বিঘ্নিত হতে পারে।

জেম্‌সের কিছু পরে সিম্বোলিক ইন্টার‍্যাকশনিস্ট কুলি (১৯০২), মিড (১৯৩৪) ও বডউইন (১৮৯৫) 'সেলফ' সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে দেখেছেন, এটি মূলত সামাজিক মিথষ্ক্রিয়াজাত, যা শৈশবে শিশুর সাথে অন্যদের ভাষাগত আদানপ্রদানের (সিম্বোলিক ইন্টার‍্যাকশন-এর) ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠে। কুলি মনে করতেন, ব্যক্তির 'সেলফ' বা 'আমি' হিসেবে যা গড়ে ওঠে তা আসলে আমার সম্পর্কে (চেহারা, প্রেষণা, কর্মকাণ্ড, চরিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে) অন্যরা কী ভাবছে সে বিষয়ে আমার কল্পনা বা বিশ্বাসের সমষ্টিমাত্র। বডউইনও একই রকম ভেবেছেন যে অন্যান্যদের সাথে ব্যক্তির একান্তই একটা সামাজিক ও দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে 'সেলফ' বা 'আমি' গড়ে ওঠে।

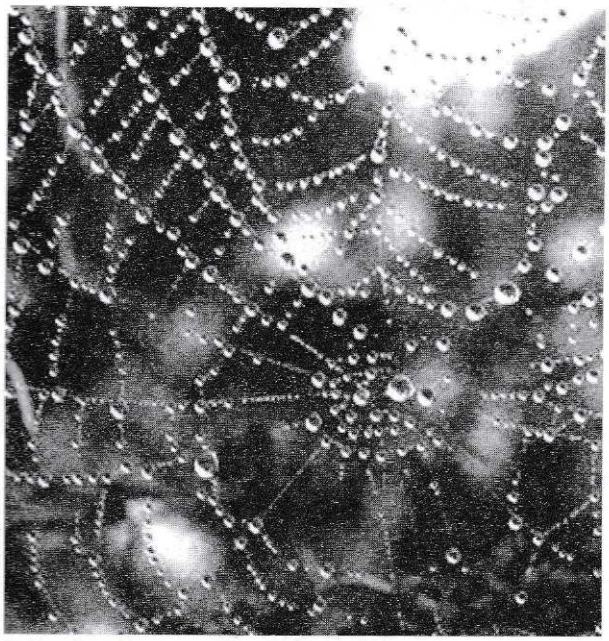

সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৯৩৩) 'ইড', 'ইগো', 'সুপার ইগো' ইত্যাকার ধারণার মাধ্যমে 'সেলফ'-এর ওপর আলোকপাত করেছেন। ফ্রয়েডিয় 'ইগো' (জার্মান ভাষায় 'ইগো'র প্রতিশব্দ 'ইচ', যার অর্থ ইংরেজির 'আই'-এর মতো) 'সেলফ'-এর কাছাকাছি একটি ধারণা, যদিও তিনি মনে করতেন 'ইগো'র কিছুটা অচেতন মনের অংশও বটে। যাই হোক, ফ্রয়েডিয় ও নিও-ফ্রয়েডিয়গণ 'সেলফ'কে একটা মৌলিক সাইকোলজিক্যাল একক হিসেবে কখনও বিবেচনা করেন নি বা তাঁরা তাঁদের তত্ত্বে এটিকে কোন কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবেও গণ্য করেন নি।

হিউম্যানিস্ট মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে কার্ল রজার্স (১৯৫৯) তার তত্ত্বে 'সেলফ'কে একটি কেন্দ্রীয় অবস্থান দিয়েছেন এবং সিম্বোলিক ইন্টার‍্যাকশনিস্টদের মতোই তিনিও মনে করতেন, 'সেলফ' একটি সামাজিক প্রোডাক্ট, যা আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠে। রজার্সের মতে, ব্যক্তি তার চারপাশের জগৎকে প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাতে অর্থ (meaning) আরোপ করে এবং এসব প্রত্যক্ষণ ও অর্থ-আরোপণের মাধ্যমে ব্যক্তির ফেনোমেনাল ফিল্ড (phenomenal field) বা অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এই ফেনোমেনাল ফিল্ড-এর যে অংশটুকুকে ব্যক্তি 'আমার' বা 'আমি' হিসেবে বিবেচনা করে সেটুকু দিয়েই তার 'সেলফ' তৈরি হয় এবং এটি প্রধানতঃ চেতন। রজার মনে করতেন, 'সেলফ'-এর এরকম একটি সংজ্ঞাই সঠিক এবং তা গবেষণার উপযুক্ত; 'সেলফ'-এর সংজ্ঞায় অচেতন বিষয়াদি যোগ করলে তা বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার আওতার বাইরে চলে যায়।

কগনিটিভ সাইকোলজিস্টরা 'সেলফ'-কে একটি একক সত্তার চেয়ে অনেকগুলো স্কিমা-য় (schema) গড়া একটি সিস্টেম হিসেবে দেখাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। তাঁরা একটি নয়, একগুচ্ছ 'সেলফ'-এর সম্ভাবনা কল্পনা করেছেন (মারকাস ১৯৭৭; ক্যানটর এবং খিলস্ট্রর্ম, ১৯৮৭)। কগনিটিভিস্টদের মধ্যে বান্দুরা-র (১৯৮৬) 'সেলফ-এফিক্যাসি' বিষয়ক ধারণা 'সেলফ' সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণার ওপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে আছে। 'সেলফ-এফিক্যাসি'র মূল কথা হচ্ছে প্রতিটি মানুষের নিজের সক্ষমতার ব্যাপারে কিছু বিশ্বাস আছে, যা তার প্রকৃত সক্ষমতা থেকে ভিন্ন হতে পারে। এই বিশ্বাসই তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সে কতটা সফলভাবে তার দক্ষতা ও জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটাতে পারবে তা তার এই সক্ষমতা বিষয়ক বিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

বিজ্ঞান হিসেবে সাইকোলজির
একটি বড় দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা সম্ভবতঃ
এই যে এটি কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ধারণার বিভিন্ন
দিককে অস্তিত্বশীল ও সত্য বলে ধরে নিয়ে
কাজ করে, কিন্তু মূল ধারণাগুলোকে
সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারে না।
উদাহরণ হিসেবে 'মন' এবং 'সেলফ'-এর
উল্লেখ করা যায়। এ দুটির কোন সংজ্ঞা
সাইকোলজিতে পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু এদের
নিয়ে গবেষণার কোন শেষ নেই।

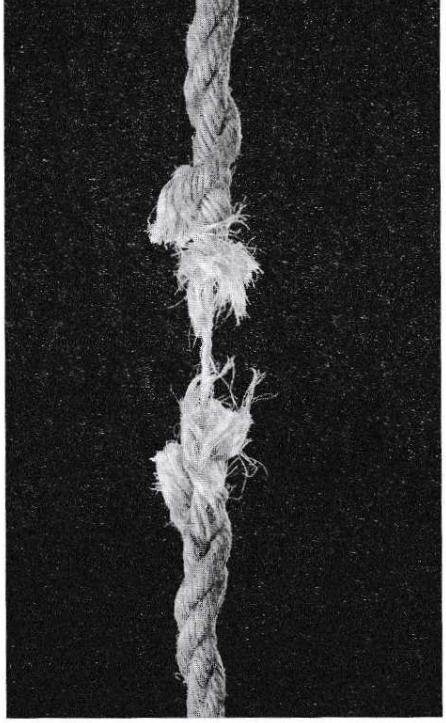

বিভিন্ন সময়ের সাইকোলজিস্টদের ভাবনা ও গবেষণা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন এমন একটা 'সেলফ' বা 'আমি' যা একাধারে যোগ্য, প্রত্যয়ী, বিশেষ এবং সক্ষমতাযুক্ত (এরিকসন, ১৯৫৯; লোয়েভিনগার, ১৯৮৯; হোয়াইট, ১৯৫৯; বান্দুরা, ১৯৭৭)। পক্ষান্তরে, বহুমাত্রিক দুর্বলতার (বিভিন্ন চাপ ও উদ্বেগজনিত ডিসঅর্ডার, বিষণ্নতা, মদ ও মাদকাসক্তিসহ বিভিন্ন মানসিক ও আচরণগত সমস্যার) সাথে 'সেলফ'-এর সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে।

সাম্প্রতিকালে মনোবিজ্ঞানীরা কগনিটিভ থেরাপি ও কগনিটিভ বিহেভিয়র থেরাপি প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিসঅর্ডারের সাথে 'সেলফ' বা 'আমি'র সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে ব্যাপক অন্তর্দৃষ্টি ও তথ্য-উপাত্ত পেয়ে আসছেন। দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রেই ব্যক্তির 'আমি/আমার'-সংশ্লিষ্ট নেতিবাচক ধারণা বা বিশ্বাসের (*আমি খারাপ, আমি অযোগ্য, আমি অদক্ষ, আমি অবাঞ্ছিত, আমি হতভাগা, আমি অসুন্দর, আমি পাপী, আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আমার দ্বারা কিছু হবে না, কোন কিছুই আমার নিয়ন্ত্রণে নেই ইত্যাদির*) মৌলিক ভূমিকা রয়েছে এবং এসবের পরিবর্তন সাপেক্ষেই উপসর্গের প্রশমন ঘটে।

বর্তমান সময়ে যেহেতু বিশ্বব্যাপী মানুষের মানসিক সমস্যা এবং ডিসঅর্ডারের রেখাচিত্র ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বমুখী হচ্ছে, সুতরাং, আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে মানুষের 'আমি'-টা আগের যে কোন সময়ের চেয়ে সহজে নেতিবাচকতায় আক্রান্ত হয়ে ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই 'আমি' বা 'সেলফ' কখন-কেন-কীভাবে ভঙ্গুরদশা প্রাপ্ত হয়?

এ প্রশ্নের সহজ কোন উত্তর আমাদের জানা না থাকলেও, আমরা ধারণা করতে পারি যে অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল বর্তমান পৃথিবী, জীবনের তীব্র গতি, অস্বাভাবিকভাবে তীব্র প্রতিযোগিতা, জীবন-জীবিকার ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা, সনাতন পরিবারব্যবস্থার ক্রমাবলুপ্তি, প্রকৃতি ও মানুষের সৃষ্ট বিপর্যয়, যুদ্ধ ও সন্ত্রাসসহ বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে মানুষের ইদানিং সমস্যা হচ্ছে; 'সেলফ' বা 'আমি' তাই ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে। জীবনের সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে, মানুষ যখন বলে উঠছে, 'আমি আর পারছি না - কোন কিছুই আর আমার নিয়ন্ত্রণে নেই', তখন আমরা বুঝতে পারি, কর্তারূপী 'আই-সেলফ' বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, তার 'সেলফ-এজেন্সি' নামক বৈশিষ্ট্য দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই অবস্থাই 'সেলফ'-এর ফ্রাজাইলিটি (fragility) বা ভাঙ্গনপ্রবণতার ইঙ্গিত দেয়। উদ্বেগ, বিষণ্নতা, পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার, মদ ও মাদকাসক্তি ইত্যাদি ডিসঅর্ডারগুলোতে আমরা ভঙ্গুর 'সেলফ'-এর সন্ধান পাই। তবে, কোনটি প্রাইমারি, অর্থাৎ 'সেলফ'-এর ভাঙ্গনপ্রবণতা এই ডিসঅর্ডারগুলোর জন্য দায়ী না ডিসঅর্ডারগুলোর কারণে 'সেলফ' ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে, তা নির্ণয় করা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। আবার জীবনের শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও যে মানুষগুলো কর্মক্ষম হয়ে টিকে আছে, কোন ডিসঅর্ডার যাদের গ্রাস করে নি, সেই 'সেলফ'গুলো কীভাবে টিকে থাকল, তাও খুব কৌতুহলোদ্দীপক। তাহলে, মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে, কিছু 'সেলফ' বা 'আমি' কেন ও কীভাবে ভঙ্গুর হয়ে পড়ে এবং কিছু কেন ও কীভাবে টিকে থাকে।

সাম্প্রতিকালে মনোবিজ্ঞানীরা কগনিটিভ থেরাপি ও কগনিটিভ বিহেভিয়র থেরাপি প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিসঅর্ডারের সাথে 'সেলফ' বা 'আমি'র সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে ব্যাপক অন্তর্দৃষ্টি ও তথ্য-উপাত্ত পেয়ে আসছেন। দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রেই ব্যক্তির 'আমি/আমার'-সংশ্লিষ্ট নেতিবাচক ধারণা বা বিশ্বাসের মৌলিক ভূমিকা রয়েছে এবং এসবের পরিবর্তন সাপেক্ষেই উপসর্গের প্রশমন ঘটে।

বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন সাইকোথেরাপি কেন ও কীভাবে 'সেলফ' ভঙ্গুর হয়ে পড়ে, সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চাইতে, কীভাবে ভগ্ন 'সেলফ'গুলোকে মেরামত করা যায়, সে বিষয়ে বেশি আগ্রহী। ফলে, সাইকোথেরাপিগুলোকে কিউরেটিভ হিসেবে আমরা যতটা পাই প্রিভেনটিভ রোলে ততোটা দেখতে পাই না। অথচ, 'প্রিভেশন ইজ বেটার দ্যান কিউর' - এই তত্ত্ব মেনে 'সেলফ'গুলো যাতে ভেঙ্গে না পড়ে সেদিকে অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার মনোবিজ্ঞানীদের। এই বিবেচনায় 'সাইকোলজি অব সেলফ' বা 'আমি-র মনোবিজ্ঞান' বর্তমান সময়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

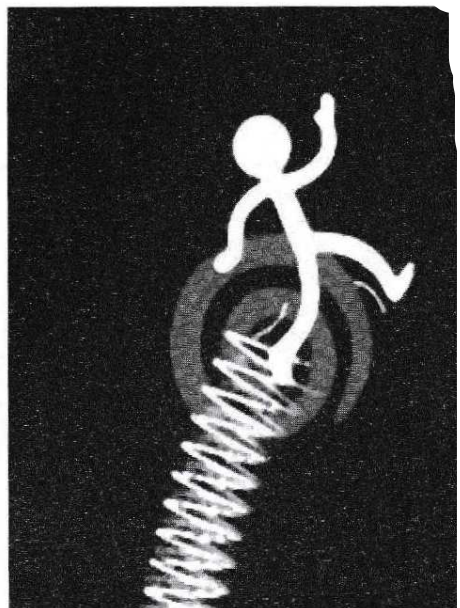

পাশ্চাত্যে 'সাইকোলজি অব সেলফ' বা 'আমি-র মনোবিজ্ঞান' নিয়ে খণ্ড খণ্ড কাজ হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন প্যারাডাইম থেকে - যেমন, সাইকোঅ্যানালাইটিক, কগনিটিভ-বিহেভিয়র, ট্রানজেকশনাল-এ্যানালাইটিক,

রোল থিয়োরি, সিম্বোলিক ইন্টার‍্যাকশনিজম, ডায়ালেকটিক্যাল বিহেভিয়র থেরাপি ইত্যাদি। অবশ্য, এসবের মূল লক্ষ্য সাইকোপ্যাথলজির ব্যাখ্যা ও এর নিরাময়। প্যারাডাইমগত পার্থক্য সত্ত্বেও, 'সেলফ' বা 'আমি' বিষয়ে প্রচুর কমন (common) বিষয় ও থিম (theme) এসবের মধ্যে লক্ষ করা যায়। এ সকল কমন জ্ঞানকে এক বা একাধিক ইন্টিগ্রেটেড মডেলের মধ্যে আনার একটা প্রচেষ্টা আজকের মনোবিজ্ঞানীরা করতেই পারেন।

একটি পদ্ধতিগত ধারাবাহিক প্রচেষ্টা যদি একদল মনোবিজ্ঞানী চালিয়ে যান তাহলে মানব জাতির জন্য যুগোপযোগী অতি মূল্যবান তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক জ্ঞানের সূত্রপাত হতে পারে। এই প্রচেষ্টার অন্যতম লক্ষ্য হবে 'সেলফ' বা 'আমি'-র ভাঙ্গনপ্রবণতার পূর্বশর্তগুলো বিশদভাবে বের করে তার কারণ ব্যাখ্যা করা; এমন কিছু সূত্র বের করা যা দিয়ে যে কোন ব্যক্তি-মানুষের 'আমি'-র শক্তি এবং ঝুঁকিগুলো আগে থেকেই সনাক্ত করা যাবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া যাবে। পাশাপাশি, শক্তিশালী 'আমি' তৈরির নিয়মগুলোও এথেকে বেরিয়ে আসবে।

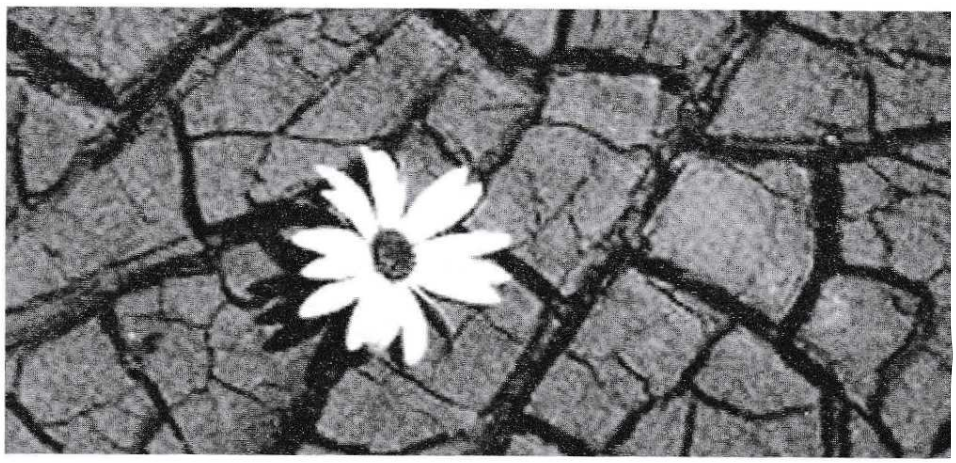

'আমি-র মনোবিজ্ঞান' (Psychology of Self) হবে 'আমি'-র জন্য একাধারে প্রতিরোধী (preventive), নিরাময়ী (curative), ঘাতসহ (resilient) এবং সৃজনশীল (creative)। যেসব মনোবিজ্ঞানী একাজে ব্রতী হবেন তাদের হতে হবে মুক্ত চিন্তার অধিকারী এবং সকল মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের ব্যাপারে মুক্ত মনের আগ্রহী সাধক। এখনও পর্যন্ত প্রায়োগিক মনোবিজ্ঞান মূলতঃ মানুষকে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'আমি-র মনোবিজ্ঞান' হয়ে উঠতে পারে আনন্দময়, সৃজনশীল মানব তৈরির বিজ্ঞান।

তরুণ কান্তি গায়েন
চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী ও জেনারেল সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি
ই-মেইল: tarun.gayen@yahoo.com

তথ্যসূত্র:

- Baldwin, J. M. (1895). *Mental Development of the Child and the Race: Methods and Processes.* New York: Macmillan.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. *Psychological Review, 84,* 191-215.
- Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory.* Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall.
- Cantor, N., & Khilstrom, J. F. (1987). *Personality and Social Intelligence.* Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Cooley, C. H. (1902). *Human Nature and the Social Order.* New York: Charles Scribner's Sons.
- Epstein, S. (1990). The Self-concept, the Traumatic Neuroses, and the Structure of Personality. In D. Ozer, J. Healy & A. J. Stewart (Eds.), *Perspectives on Personality* (Vol. 31, pp. 31-59). Greenwich, CT: JAL Press.
- Erikson, E. (1959). *Identity and the Life Cycle.* New York: Norton.
- James, W. (1890). Principles of Psychology. New York: Holt.
- Loevinger, J. (1976). *Ego Development: Conceptions and Theories.* San Francisco: Jossey-Bass.
- Markus, H. (1977). Self-schemata and Processing Information about Self. *Journal of Personality and Social Psychology, 35,* 63-78.
- Markus, H., & Cross, S. (1990). The Interpersonal Self. In L. A. Pervin (Ed.), *Handbook of Personality: Theory and Research* (pp. 576-608). New York: Guilgord Press.
- Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist.* Chicago: University of Chicago Press.
- Rogers, C. R. (1959). A Theory of Therapy, Personality, and Interpersonal Relationships as Developed in the Client-centered Framework. In S. Koch (Ed.), *Psychology: A Study of Science* (pp. 184-256). New York: McGraw-Hill.
- White, R. (1959). Motivation Reconsidered: The Concept of Competence. *Psychological Review, 66,* 297-333.